প্র বা হ

সিটি কলেজ বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা। অবরুদ্ধ সময়ের বিশেষ সংখ্যা। ১৫ অগস্ট ২০২০

সকলেই আড়চোখে সকলকে দ্যাখে

'নিউ নর্মাল' যুগে এখন আমরা। নর্মাল শব্দটির সংজ্ঞার অদ্ভুত পরিবর্তন; যদিও নর্মাল ধারণাটি কোনো স্থায়ী বিষয় নয়, নিয়ত পরিবর্তনশীল। কারণ নর্মাল কোনো নিরপেক্ষ বিষয় নয়। স্থান-কাল-ব্যক্তি-সমাজ সাপেক্ষে তা বদলায়। এখন যে 'নর্মাল'-এ আমরা আছি, তার অনেকটাই জুড়ে আছে অমানবিকতা, সম্পর্কহীনতা। এবং সেই অমানবিকতাকে মেনে নিয়ে আমরা সুখে আছি, নিশ্চিন্ত আছি, ভালো আছি, সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে সুরক্ষিত আছি। এর ফলে মানসিক দূরত্ব যে দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে, সেটা খেয়াল করছি না। পাড়ায় পাড়ায় সতর্কতার আবরণে নির্মমতা চলছে; মানুষে মানুষে বাড়ছে অবিশ্বাস; যাঁদের সাহায্য ছাড়া অনেক পরিবারই অচল, সেই 'কাজের লোকরা' প্রায় অস্পৃশ্য, যেন যাবতীয় রোগজীবাণুর বাহক তাঁরাই। অনেক সময় নিকট আত্মীয়রাও পরস্পরকে বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছে না। পাহাড়প্রমাণ দূরত্ব ও অভিমান জমাট বাঁধছে। প্রচারের প্রতি যুক্তিহীন আনুগত্যে আত্মরক্ষার বর্মে নিজেদের ঢেকে রাখছি। মুখোশের আড়ালে অন্য একটা মুখ তৈরি হচ্ছে। স্বার্থপরতাকে ঢাকতে প্রয়োজনে যুক্তি তৈরি করে নিচ্ছি। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠছে নানা সমস্যা। অনলাইন পড়াশোনা নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ চলছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে ধরা পড়ছে শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামোগত ত্রুটি ও অর্থনৈতিক দুর্দশা। আমরা টের পাচ্ছি আমাদের ছাত্রছাত্রীরা ঠিক কেমন থাকে। কিন্তু সমাধানের পথ বাতলানো যাচ্ছে না। এই করোনা ও আমপান আপাত-সুপ্ত সমস্যাগুলোকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। করোনার সুযোগে নানাবিধ ক্ষেত্রে একতরফা সিদ্ধান্ত বহাল করতে অসুবিধে হচ্ছে না। প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়, জীবনানন্দের কবিতার লাইন 'সকলেই আড়চোখে সকলকে দ্যাখে'। এটা ১৯৪৬-৪৭-এর দাঙ্গার ক্ষেত্রেও সত্যি, সত্যি অতিমারীর ক্ষেত্রেও। আমাদের ছাত্রছাত্রীরাও এই সময়ে বিভ্রান্ত, বিচলিত। তারা তাদের ভাবনাচিন্তাগুলো লিখেছে; তারা নতুন লেখক, তারা নিজেদের মতো করে তাদের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি প্রকাশ করেছে।

নতুন প্রজন্ম কীভাবে সমস্যার মোকাবিলা করছে এখানে সেটা দেখাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই তৈরি আমরা করলাম এই ই-ম্যাগাজিন বা ই-জিন, 'প্রবাহ'। বাংলা বিভাগীয় এই পত্রিকা অনেকদিনের, যদিও অনিয়মিত।

অন্যান্য পৃষ্ঠায়

ত্রাসের রাজত্বে। সাগ্নিক সরকার ২
আলোর ব্লকলিস্ট থেকে বলছি। গৌরব সাহা ৫
আমার রক্তে দেশদ্রোহিতা পজিটিভ। রাজেশ ঘোষ ৬
দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না। বিদিশা দলুই ৭
ঘরবন্দী তালাবন্দী। লাবণি নাথ ৮
প্রকৃতির প্রতিশোধ। দিশা দাস ৯
আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি। রিয়া ঘোষ ১০
অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো। রেমা দাস ১১
অবাক পৃথিবী। নয়না কুন্ডু ১৩
পৃথিবী আবার শান্ত হবে। অর্পিতা গাঙ্গুলী ১৪
নিজেকে জানলাম। শ্রীপর্ণা ব্যানার্জী ১৫
গৃহবন্দীর স্বীকারোক্তি। মৌমিতা সর্দার ১৬

এখন যে 'নর্মাল'-এ আমরা আছি, তার অনেকটা জুড়ে আছে অমানবিকতা, সম্পর্কহীনতা। এবং সেই অমানবিকতাকে মেনে নিয়ে আমরা সুখে আছি, নিশ্চিন্ত আছি, ভালো আছি, সামাজিক দূরত্ব রক্ষা করে সুরক্ষিত আছি।

ত্রাসের রাজত্বে

সাগ্নিক সরকার। সেমেস্টার ৪

"লকডাউন", সত্যি বলতে ছোট থেকে আজ পর্যন্ত আমার মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র শব্দ ভান্ডারে এই শব্দের উপস্থিতিএকেবারেই ছিল না। অশ্রুতপূর্বই বলতে হয়। কিন্তু কয়েক দিনের ব্যবধানে লকডাউন শব্দটি এমন ভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে মিশে গেছে যেন দিন, তারিখ, মাস, বার সব ভোলার উপক্রম। শুধু লকডাউনের ১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমসংখ্যা, কখনও আনলক আবার কখনোবা সাপ্তাহিক, পাক্ষিক লকডাউন। এই তো সেদিনের কথা, সরস্বতী পুজোর দুদিন পর বাড়িতে মাংস রান্নার কথা উঠতেই কথা উঠেছিল চীনের নতুন একটা রোগের সংক্রমণ নিয়ে। চীনের লোক অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে রোগাক্রান্ত হয়েছে বলে আলোচনা করছিলাম। আমার দিদা বলল, সেই কোন চীনে লোকের নতুন রোগ দেখা দিচ্ছে অথচ আমরা তৎক্ষণাৎ জানছি। সভ্যতার এই অগ্রগতির ব্যাপারটা সেযুগীয় বোধগম্যতার বশবর্তী হয়ে আমিও একটু ভেবেছিলাম। কিন্তু এতটাও ভাবিনি যে, আমরা উন্নত সভ্যতার এমন অগ্রগতিতে পৌঁছে গেছি যেখানে শুধু খবর নয়, রোগের জীবাণুও সভ্যতার বাহনে চেপে আমাদের দেশ তথা সারা বিশ্বে ত্রাসের রাজত্ব করবে নিমেষেই। এই রোগ যে বৈশ্বিক মহামারীর করাল রূপ ধারণ করবে তা কে ভেবেছিলাম!

প্রতিটি দেশের সরকার নিরুপায় হয়ে লকডাউন ঘোষণা করল যা কালক্রমে বদলে দিল আমাদের সামাজিক, পারিবারিক তথা ব্যক্তি জীবনের চিরাচরিত রূপ। জীবনে যোগ হল একেবারে নতুন একটা অভিজ্ঞতা।

মানুষ হিসেবে আমরা প্রত্যেকে ছোট থেকে শিক্ষা পাই সামাজিক ঐক্যবদ্ধতার। এটাই আমাদের সামাজিক জীবের পরিচায়ক। বিপদে আপদে সবার হাতে হাত রাখা। কিন্তু কোরোনার মতো স্মরণকালের ভয়াবহ পরিস্থিতি আমাদের শুধু ঘরবন্দী করেনি, সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখার নতুন উপদেশ শিক্ষা দিচ্ছে। সমগ্র বিশ্ব গৃহবন্দী অদৃশ্য এক শত্রুর ভয়ে। বেঁচে থাকাটাই যেন এখন সবচেয়ে বড়ো উৎসব। চারদিকে মৃত্যুর মিছিল, গণকবর, মারণব্যধির থাবা এসবের ত্রাসে মানুষ শুধু প্রাণভয়ে বাধ্য হয়ে গৃহবন্দী। কিন্তু নিম্ন আয়ের ও শ্রমজীবী মানুষের দুর্দশা আজ চরমে উঠেছে। কর্মহীন হয়ে পড়েছে অগণিত মানুষ। পেটে খাবার নেই সমাজের তথা বিশ্বের বড়ো অঙ্কের মানুষের। সব মিলিয়ে করোনাভাইরাস ও তা প্রতিহত করতে লকডাউন ব্যবস্থা দুই সমাজের ওপর যে প্রভাব ফেলেছে তা কল্পনার অতীত। কারণ ঘরে বসেই বা মানুষের দুর্দশা কতটা অনুমান করতে পারছি আমরা, মিডিয়াই বা কতখানি পারছে।

সামাজিক জীবনের বৃহত্তর পরিসরে লকডাউনের প্রভাব যেমন লক্ষণীয় তেমনই পারিবারিক জীবনেও কম নয়। তবে ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের গন্ডিতে এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক দু ধরনের প্রভাবই আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ইতিবাচক যদি বলি তবে পরিবারের সকলের

সাথে সময় কাটানোর একটু ফুরসত মিলছে সবার, যা আধুনিক যান্ত্রিক জীবনে মানুষ প্রায় হারাতেই বসেছে। বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে একটু সময় অতিবাহিত করা, পুরনো দিনের গল্প বলা, বাচ্চাদের সাথে জমিয়ে সময় কাটানো, সকলে মিলে বসে খাওয়া এগুলো একটা সুস্থ জীবনের জন্য নিতান্তই অপরিহার্য। হাজার চেষ্টায়ও এসব হয়ে ওঠেনা, লকডাউন তার একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। আমাদের মতো ছাত্রছাত্রীদেরও পাঠ্যক্রম অতিক্রম করে কতটুকুই বা সময় হয় নিজেদের মনের তৃষ্ণা মেটাতে সখের সলিলে অবগাহন করার! কারো বই পড়া, কারো লেখালেখি বা ছবি আঁকা, কেউ বা নাচ, গান, আবৃত্তি অথবা বাড়ির কোণে ভালোলাগার ফুলগুলির একটু পরিচর্যা এসবের জন্য না জানি কতকাল পরে কারো অবসর মিলছে। বিশেষ করে বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের দ্বারা বেশ ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পারছি যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন অনেক ভালোলাগা ও গুণের সমাবেশ রয়েছে যা এর আগে সত্যিই জানতাম না। বিশেষ করে আমার কিছু অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এতো ভালো ছবি আঁকতে পারে আবার কয়েকজন খুব ভালো আবৃত্তিও করতে পারে। এর সবই জানলাম এই লকডাউনের দৌলতে। শহরের পারিবারিক জীবনের মধ্যে একটু আনন্দের আভাস দেখা যায়। কাজের লোকের ছুটি, তাই অনভ্যস্ত হাতগুলি যখন ঘরের সমস্ত কাজ সেরে সবাই মিলে রান্না করছে তখন ব্যাপারটা কষ্টকে ছাপিয়ে বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে।কিন্তু মাসের পর মাস একইভাবে চলতে থাকায় এই ইতিবাচক ভাব যেন ক্রমশই ম্লান হতে থাকে।কারণ বেশিরভাগ মানুষের গচ্ছিত অর্থ এই সুদীর্ঘমেয়াদী গৃহবন্দী দশার মোকাবিলার জন্য মোটেই পর্যাপ্ত নয়। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে যায় মাস খানেক পেরোতেই। একঘেয়েমি বন্দী দশা আর অর্থ চিন্তা রূপ নিতে শুরু করে মানসিক অশান্তি আর হতাশার। একদিকে প্রাণের ভয় অন্যদিকে অর্থচিন্তা। এর পর মাসের পর মাস ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ। সব মিলিয়ে দুশ্চিন্তার আকৃতি যেন পর্বতসম।

এ তো গেল তথাকথিত পরিবারের ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে হয় চারদেওয়ালের মাঝে পরিবারের গন্ডি আঁকা যায় না। আমার কাছে আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহপাঠী, ক্লাসরুম, কলেজের বারান্দা থেকে প্রতিটি কোণা যেখানে আমার নিত্যদিনের বৃহত্তর এরটা অংশ অতিবাহিত হয়। এই বন্দী দশায় খুব মনে পরে সেই সময় গুলো। আজ এই পরিস্থিতিতে আমরা কেউ জানি না কবে কার সাথে কোথায় দেখা হবে। মনের মধ্যে কতো আয়োজন ছিল আমাদের। কলেজের কয়েকটা অনুষ্ঠান, আমাদের বিভাগের শতবর্ষ, পরীক্ষা, নতুন শিক্ষাবর্ষ সব যেন পন্ড হয়ে গেল । এসব ভাবলে গৃহবাস যেন আরও বিষময় হয়ে ওঠে। তবে এর মাঝেও যে জীবনে নতুনত্বের আস্বাদ পাইনি তা কিন্তু নয়। আমরা সেই প্রজন্মের খাতায় নাম লিখিয়েছি যারা ঘরে বসে অনলাইন ক্লাস শুরু করে। পরিস্থিতির চাপে হলেও ব্যাপার টা বেশ উপভোগ করেছি । সেই সাথে অনলাইনে বন্ধুদের সাথে আড্ডা, সুখ দুঃখের গল্প আদানপ্রদান সবমিলিয়ে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। তাই স্বীকার করতেই হয় যে লকডাউন আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছেও বটে।

করোনার ভয়াবহতা হ্রাস করতে এই লকডাউন আমাদের পারিবারিক জীবনের হারানো অতীত ও প্রয়োজনীয় দিকগুলি যেমন ফিরিয়ে দিয়েছে তেমনই ব্যক্তিগত জীবনে সঞ্চার করেছে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন শিক্ষা।

এর মাঝেও যে জীবনে নতুনত্বের আস্বাদ পাইনি তা কিন্তু নয়। আমরা সেই প্রজন্মের খাতায় নাম লিখিয়েছি যারা ঘরে বসে অনলাইন ক্লাস শুরু করে। পরিস্থিতির চাপে হলেও ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করেছি ।

কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশের দিকে তাকালে আমরা একই সাথে অতীত, প্রয়োজনীয়তা, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা সবই পেয়েছি। হতে পারে করোনাভাইরাস বিশ্বের বড়সড় এক বিপর্যয়, কিন্তু তা কেবলই মানব জাতির জন্য। নদীনালা, বাতাস, মাটি, গাছপালা, লক্ষ লক্ষ স্থলজ ও জলজ প্রজাতি সবার জন্যই কিন্তু এটা একটা আশীর্বাদ স্বরূপ। যেদিন থেকে আমরা নিজেদের স্বার্থে কংক্রিটের ব্যবহার শুরু করেছি, নির্মাণ করেছি বিষ নিষ্কাশনকারী কলকারখানা আর যানবাহন, ধ্বংস করেছি বিস্তীর্ণ বনশোভা, বিপর্যস্ত করেছি প্রাণীকুলের বাসস্থান সেদিন থেকেই যেন সমস্ত প্রকৃতি আমাদের অভিশাপ দিতে শুরু করেছে। স্রষ্টা যেন আজ তাদের আর্তনাদ শুনেছেন। আজ বন্ধ সব কলকারখানা, যানবাহন। যা শতাব্দী কাল ধরে প্রতিনিয়ত দূষিত করেছে মাটি, বায়ু আর জলকে। খবর পাচ্ছি দূষিত নদীগুলোও দূষণ মুক্ত হয়েছে। পরিষ্কার জলে প্রচুর মাছ এবং অন্য জলচর দেখা যাচ্ছে যা বহুকাল দৃষ্টিগোচর হয়নি। বায়ু দূষণ বন্ধ হওয়ায় আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। তাপমাত্রা একটু হলেও কমেছে। বৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমার পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ জন যমুনা নদীর কিছু ছবি পাঠিয়ে ছিল যা সত্যিই অবাক করার মতো। দূষণের মাত্রাতিরিক্ততায় যে যমুনা নর্দমার রূপ নিয়েছিল তাও এ সময় একেবারে স্বচ্ছ । সেই বৈষ্ণব পদাবলীর নীল যমুনার চিত্র ধরা দিয়েছে যেন। এছাড়া আমার কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে। লক্ষ্য করেছি যে, রাস্তার পাশে বহুদিন ধরে যে গাছগুলো অসহায় শিশুর মতো অযত্নে অসহায় হয়ে জীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল, মানুষ আর যানবাহনের পাশবিকতায় বেড়ে ওঠার সাহস পায়নি, এখন মানুষের অনুপস্থিতি বুঝতে পেরে তারাও শরীর বিকশিত করার সুযোগ পেয়েছে। জানি এই সুখ মানুষ বেশি দিন টিকতে দেবে না তবুও দেখে মানুষ হয়ে নিজেদের হিংস্রত্বটা একবার অনুভব করা যায়। সত্যিই মাঝে মাঝে মনে হয় পৃথিবী যেন এই মানব জাতির উৎপীড়ন থেকে এবার মুক্তি চাইছে।

আমরা হয়তো আবার হারানো ছন্দে ফিরব কিন্তু এই পরিস্থিতি আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কিভাবে বাঁচতে হয়। পরিবারের অভ্যন্তরীণ ছোট ছোট আনন্দ কতখানি মূল্যবান, শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত, প্রকৃতির প্রতি কতটা দায়বদ্ধতা এসব সম্পর্কে যদি আমরা এখনি সচেতন না হই তাহলে ভবিষ্যতে মানবসভ্যতা চরমতম সঙ্কটের মুখে পড়বে। এছাড়া আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিও সচেতন হতে হবে। অনাবশ্যক বিলাসিতা পরিহার করে শরীরচর্চায় যত্নশীল হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক অবসাদ দুর করতেও সৃজনশীল বিষয়ের চর্চা আজ খুব গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হচ্ছে যা আমাদের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তিশালী তারা সহজেই এই মারণরোগ জয় করছে।

জানিনা আর কতদিন এভাবে চলতে হবে। এখনও পর্যন্ত যেহেতু এই রোগের কার্যকর কোনো প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি তাই দুশ্চিন্তার মেঘ যেন আরও ঘনিয়ে আসছে। প্রতিদিন বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা, দীর্ঘ হচ্ছে মৃত্যুর মিছিল, স্বজন হারানোর বেদনা যেন স্তব্ধ করছে ছন্দোময় মুক্ত আকাশকে, ক্ষুধা আর দারিদ্রের হাহাকার যেন সমগ্র বিশ্বে ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। তবুও আমরা নিরুপায়। বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, প্রশাসন , সরকার নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে মানুষ চিকিৎসার কাজে নিজেদের সমর্পণ করেছে ছোঁয়াচে এই রোগের যুদ্ধে। সবাই এক পরিস্থিতির শিকার। কেউ কি ভেবেছিলাম এমন দিন দেখব? যত দিন যাচ্ছে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। তবুও আমরা চেয়ে আছি আলোর আশায়। স্বপ্ন দেখছি নতুন ভোরের, আমরা আবার হাসব, আবার সব ভয়কে জয় করে সবাই এক হব, সেদিন যেন হাতছানি দিচ্ছে।

যত দিন যাচ্ছে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। তবুও আমরা চেয়ে আছি আলোর আশায়। স্বপ্ন দেখছি নতুন ভোরের, আমরা আবার হাসব, আবার সব ভয়কে জয় করে সবাই এক হব, সেদিন যেন হাতছানি দিচ্ছে।

আলোর ব্লকলিস্ট থেকে বলছি

গৌরব সাহা । সেমেস্টার ৪

হয়ত দলিত ছিল, নিয়ে গেলে ঠেলে
লাথিতে লাথিতে সব ঢেলে দিলে রাগ
চাইতে চাইতে ক্ষমা মারা গেল ছেলে
রক্ত শুকিয়ে গেলে পড়ে থাকে দাগ।

তোমরা করবে ঠিক কে কোথায় যাবে?
কার যে কী নাম হবে তুমি বলে দেবে?
যে লোক নিজের খাদ্য- 'গোস্ত' কেটে খাবে
তাকে খুন করে দিতে ছুরি হাতে নেবে!

জেহাদে মানুষ খুন করেছো অযথা
পৃথিবীতে নিজ ধর্ম ছড়ানোর শখ!
কোন ধর্মে লেখা আছে এই সব কথা?
দখল শিখিয়ে গেছে কোন প্রবর্তক?

রোজ রোজ রক্তপাত! রোজ মহাসভা!
দ্যাখো গিয়ে মসজিদে; ফুটে আছে জবা।

রোজ রোজ রক্তপাত! রোজ মহাসভা!
দ্যাখো গিয়ে মসজিদে; ফুটে আছে জবা।

আমার রক্তে দেশদ্রোহিতা পজিটিভ

রাজেশ ঘোষ । সেমেস্টার ৪

(কে বলেছে— বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে কোভিডের জন্য? ঘাস থেকে মুখটা একটু তুলে দেখলেই বুঝতে পারবেন, ভাইরাসটা আসলে এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলোর ভেঙে যাওয়া জীর্ণকায় কঙ্কাল। আপনার সামনে expose করে দিয়েছে। নইলে তো কাল অব্দি আপনিও জানতেন না যে, এ দেশে 'পরিযায়ী শ্রমিক' বলে কিছু আছে আর তাদের সংখ্যা আপনার মধ্যবিত্ত বর্গের চেয়ে ঢের বেশি। মোদ্দা ব্যাপারটা হচ্ছে রাজার যে কাপড় নেই— সে তো কাউকে বলতেই হতো, এই বেলা না হয় সে কাজটা ভাইরাসটাই করে দিয়েছে। আর এই জন্যই কোভিড পরিস্থিতি, লকডাউন এ সব নিয়ে আমার অনুভব সমাজের আর পাঁচজনের সঙ্গে ঠিকঠাক মেলে না। ক্ষমা করবেন, বিস্তারিত আলোচনায় আমার অনুভব প্রকাশ করার মতো ভাষা খুঁজে পাইনি। তাই কবিতার কনটেক্সট, মেটাফোর, সিম্বলিজিমকে আশ্রয় করেই আমার বেদনা, নৈরাশ্য, অসহায়তা, প্রতিবাদ ভাষারূপ লাভ করেছে।)

আমার রক্তে দেশদ্রোহিতা পজিটিভ।

ওরা যত বলছে, যত বোঝাচ্ছে সব কিছু কেমন যেন গোলপুঁটুলি পাকিয়ে যাচ্ছে।
অন্ধকার আরও গাঢ় হচ্ছে। দুঃসময় আরও বেঁধে ধরছে। বেঁধোনা আমায়— কষ্ট হচ্ছে
কেমন যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি— হাঁপ ধরে আসছে আমার।

পুকুরের তেলাপিয়াটাকে আর চৌবাচ্চায় বেঁধে রাখিস না— যেতে দে, যেতে দে ওকে গঙ্গাসাগর
এই লালচে দগদগে দেশের ওপর আমি খালি গায়ে চিৎকার করেছি, আমার কথা বুঝিয়েছি
নইলে যে হেরে যেতে হয়।

তবে আমি জানতাম— জানতাম আমার নগ্নতা তোদের আনন্দ দেবে না যেমন দেয় না
নিরীহের ওপর তোদের কাষ্ঠলো পেশির পুরুষত্ব। আমায় তোরা অসভ্য বলিস, নইলে বলিস
ছিট, নয়তো বা সেয়ানা পাগল। তবুও আমি যাবো না, সমাজের নগ্ন নিতম্বে গুঁজবো না মুখ।

পালাবো, উড়ে পালাবো— একেবারে উড়ে যাবো একদিন— ওজোন স্তর পেরিয়ে অন্তরীক্ষে
গিয়ে বলে আসবো তোদের নোংরামির কথা।
অভাগাকে ভাতে মেরে, নিরীহকে খেদিয়ে, চাষীকে দড়িতে ঝুলিয়ে, জাতের আফিম খাইয়ে
মায়ের সন্তানকে পিষে মেরে তোরা কেমন দেশ বানিয়েছিস, কাঁটা তার দিয়েছিস, শাসনের
গ্যালাখ্যালা করছিস। সব জানিয়ে দিয়ে আসবো।

পথে পড়ে থাকা প্রত্যেক মৃতদেহের হিসেব আমার কাছে আছে। কারো সন্তান আমি
কারও দাদা বা ভাই, কারো বন্ধু কিংবা প্রেমিক। প্রত্যেকের বিচারচাই। চাই সাজা।
পাপের বোঝা ভর্তি তোদের এ-তরী আমি ডোবাবোই। কোনো এক মহান যুদ্ধের
অপেক্ষায় বসে আছি আমি।

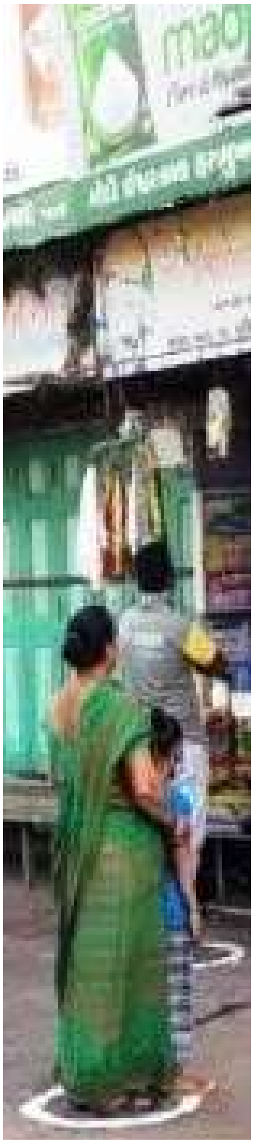

শিবরাম চক্রবর্তীর ‘দেবতার জন্ম’ গল্পটি মনে পড়ে। লেখক অফিস যাবার পথে প্রায়ই একটি পাথরে হোঁচট খাওয়ায় বিরক্ত হয়ে একদিন পাথরটি তুলে রাস্তার ধারে রেখে দেন। পরবর্তীকালে সেই পাথরটি জাগ্রত দেবতা ত্রিলোকেশ্বর শিবরূপে ভক্তদের কাছে পুজো পেতে থাকেন।

দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না

বিদিশা দলুই। সেমেস্টার ৪

বর্তমানে এক চরম দুঃসময়ের শিকার বিশ্ববাসী; ধনী-দরিদ্র, মালিক-শ্রমিক, রাষ্ট্রপ্রধান থেকে আমজনতা সকলেই। বিশ্বের নতুন অতিথি, নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) বস্তুত আকবর বাদশা'র সঙ্গে হরিপদ কেরানির ভেদ ঘুচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, বৈষম্যমূলক পৃথিবীর সাম্প্রতিক সাম্যাবস্থায় আমরা কেমন আছি? যে লোভ, হিংসা আমাদের ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক তথা আন্তর্জাতিক জীবনের শান্তি বিঘ্নিত করে, সাময়িকভাবে সেসব ভুলে আজ আমরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে তৎপর। পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। করোনা সেই বন্ধনে এনেছে লক্ষণীয় শৈথিল্য।

করোনা ভাইরাস থেকে যে করোনা রোগ সৃষ্টি হয়েছে তাতে মানুষে মানুষে দূরত্ব বজায় রাখা খুব জরুরি। কারণ এই রোগ বহু মানুষকে দ্রুত সংক্রমিত করার ক্ষমতা রাখে। যেহেতু এই রোগটি নতুন তাই এর কোনও প্রতিষেধক নেই। ফলে ব্যাপক হারে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, যা মহামারীর রূপ নিয়েছে। জ্বর, কাশি, গলাব্যথা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি এই রোগের লক্ষণ। আক্রান্ত ব্যক্তির রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে সাধারণত পাঁচ থেকে সাতদিন সময় লাগে। যে কোনও রোগে আক্রান্ত মানুষকে সুস্থ করতে প্রয়োজন উপযুক্ত চিকিৎসা এবং শুশ্রূষা। কিন্তু করোনা রোগীর সংস্পর্শে থাকা চিকিৎসক এবং নার্সরা যখন আক্রান্ত হতে শুরু করেন তখন আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি। এই কারণেই করোনা রোগ আমাদের কাছে ভয়ংকরতম। বিজ্ঞানীরা নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এর ওষুধ ও ভ্যাকসিন তৈরি করার। যেহেতু ভাইরাসটির চারিত্রিক গঠন পরিবর্তনশীল তাই এর কোন ওষুধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তবে আশা করা যায়, শীঘ্রই এর ওষুধ আবিষ্কৃত হবে।

করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি স্থল মনে করা হয় চীনের উহান প্রদেশ। চীন থেকে ক্রমে তা ভারতবর্ষ সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের দেশে রোগপ্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার প্রথম লকডাউন ঘোষণা করে মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, অফিস, আদালত, কলকারখানা, ধর্মীয় স্থান ইত্যাদি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মানুষকে গৃহবন্দী থাকতে হয়। জুন মাসে লকডাউন একটু শিথিল করা হয়। তবে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন এখনও বন্ধ। অনলাইনে মাঝে মধ্যে ক্লাস হচ্ছে। তবে গৃহবন্দী অবস্থায় লেখাপড়ায় মন বসে না। কলেজের পরীক্ষার কোনও নিশ্চয়তা নেই বলে এই নিয়ে ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। কবে যে স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবো আমাদের মনে কেবলই সেই ভাবনা।

উৎসব হল মানুষের মিলনস্থল। যে কোনও উৎসব প্রতিদিনকার একঘেয়ে জীবনে মুক্তির স্বাদ আনে। জন সমাগম ব্যতীত উৎসবের সার্থকতা নেই। কিন্তু লোক সমাবেশে করোনা রোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনায় সরকারি নির্দেশে বন্ধ রাখা হয় উৎসব। তাই চৈত্র-সংক্রান্তি, নববর্ষ, রথযাত্রা, ঈদ ইত্যাদি বাঙলির উৎসবের এইদিনগুলিও অতিক্রান্ত হল নীরবে। জানিনা এ বছর শারদোৎসব, কালীপুজো ও ভাইফোঁটার মতো অতি জনপ্রিয় উৎসবগুলিও হয়তো এমনই নীরবে কেটে যাবে কিনা। উৎসবের অস্তিত্ব আজ শুধু অতীত স্মৃতিচারণায়।

করোনা রোগের সংক্রমণ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে বিজ্ঞানীরা প্রতিষেধক আবিষ্কারে ব্যস্ত। অন্যদিকে কিছু সাধারণ মানুষ করোনা আতঙ্ক থেকে মুক্ত হতে ‘করোনা দেবী’কে পুজো করতে ব্যস্ত। অতীতে যেমন মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়, হিংস্র প্রাণী কিংবা অজানা রোগের প্রকোপ থেকে মুক্তি পেতে দেবদেবীর কল্পনা করেছে ঠিক সেই ভাবে আজ করোনা দেবীরও উদ্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শিবরাম চক্রবর্তীর ‘দেবতারজন্ম’ গল্পটি মনে পড়ে। লেখক অফিস যাবার পথে প্রায়ই একটি পাথরে হোঁচট খাওয়ায় বিরক্ত হয়ে একদিন পাথরটি তুলে রাস্তার ধারে রেখে দেন। পরবর্তীকালে সেই পাথরটি জাগ্রত দেবতা ত্রিলোকেশ্বর শিবরূপে ভক্তদের কাছে পুজো পেতে থাকেন। এমন কি সেই দেবতার মন্দিরও এক দিন নির্মিত হয়। বসন্ত রোগের আতঙ্ক থেকে নিজেকে বাঁচাতে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজির প্রতিষেধক নিয়েও শেষপর্যন্ত সবার অলক্ষ্যে ত্রিলোকেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে প্রণাম করেন গল্পকথক। হয়তো করোনা দেবীও একদিন জাগ্রত দেবীর মতোই পূজিতা হবেন।

‘মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি’।

এরপর আটের পাতায়

সাতের পাতার পরে

অতীতেও মহামারী এসেছে। মানুষ তাকে জয়ও করেছে। করোনা মহামারীতে আমরা যতোই আতঙ্কিত, বিভ্রান্ত হইনা কেন, এই পরিস্থিতিকে আমরা কাটিয়ে উঠবোই। সচেতনতার সঙ্গে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে নিজেকে এবং অন্যকে সুস্থ রাখতে সকলকে নির্ভয়ে এগিয়ে আসতে হবে। মৃত্যুর আগে মৃত্যু-ভয়ে ভীত হব না। আমাদের ‘ভয় ভাঙা নায়ে’, ‘বিষম ঝড়ের বায়ে’ আমরা ‘মারের সাগর পাড়ি দেব’ এবংএকদিন ঠিক গন্তব্যে পৌঁছে যাবো— এই বিশ্বাস রাখি।

ঘরবন্দী তালাবন্দী

লাবণি নাথ। সেমেস্টার ৪

কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং কাজ চলে গেছে হাজার হাজার শ্রমিকের। যারা দিন আনে দিন খায় তাদের জন্য কোনো জায়গা থেকে একদল মানুষ তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এরপর কোভিড ১৯-এর জন্য লকডাউন আর তারই মধ্যে আসে আমপান ঘূর্ণিঝড়ের দাপট। যা সুন্দরবন, দীঘা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপর দিয়ে যায় এবং খুব ক্ষতি করে।

১৪২৭ সন বা ২০২০ সালের শুরু থেকেই শোনা যায় কোভিড-১৯ এর কথা যা আমাদের পার্শ্ববর্তী অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। তারপর ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যে এই ভয়াবহ রোগটি হাতছানি দেয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম ১৭ই মার্চ বেলেঘাটা আইডি তে কোভিড ১৯ এ আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যায় আর তারপর থেকে অর্থাৎ ২৪শে মার্চ মাঝ রাত থেকে শুরু হয় লকডাউন। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে এক অপরিচিত জীবনে পা রাখি। লকডাউনে শুধু চিকিৎসা কেন্দ্র এবং ওষুধ ও মুদির দোকান ছাড়া সব বন্ধ হয়ে যায়। যানবাহন ব্যবস্থাও বন্ধহয়ে যায়। লকডাউন অবস্থায় বারবার হাতে সাবান দেওয়া ও হাত স্যানিটাইজ করা এবং কোনো দোকানে গেলে দূরত্ব বজায় রাখা ও মুখে মাস্ক পড়া আমাদের জীবনের একটা অনিবার্য অংশ হয়ে ওঠে। স্কুল,কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ঘরবন্দী অবস্থায় অনলাইনে ক্লাস করে। এই কোভিড ১৯ এর কারণে অনেক শিল্প কর্মচারী বাধ্য হয়েছে বাড়িতে বসে যতটা সম্ভব কাজ করতে যাতে এই কোভিড ১৯ এর আতঙ্ক কমে। অনেক কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং কাজ চলে গেছে হাজার হাজার শ্রমিকের। যারা দিন আনে দিন খায় তাদের জন্য অনেক এলাকায় এবং অনেক স্টেশনে, নির্দিষ্ট কোনো জায়গা থেকে একদল মানুষ তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এরপর কোভিড ১৯- এর জন্য লকডাউন আর তারই মধ্যে আসে আমপান ঘূর্ণিঝড়ের দাপট। যা সুন্দরবন, দীঘা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপর দিয়ে যায় এবং খুব ক্ষতি করে। বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় বাড়ি ঘর ভেঙে পড়ে, জলের তলায় চলে যায় রাস্তাঘাট, জমি, বাড়ি, বহু মানুষ মারাও যায় । তারপর আমপানের দাপট কাটতে না কাটতেই চতুর্থ পর্যায়ে লকডাউনের পর, লকডাউন তুলে নিয়ে আনলক করে দেওয়া হয় অনেক বাধ্যতামূলক নিয়মের মধ্য দিয়ে। আনলক১-এ সরকারি বাস ও অটো চালু হলেও তাতে পরিবহনের মূল্য অনেক বেড়েছে। এই কোভিড ১৯-এর ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে ভেঙে পড়েছে রাজ্যগুলো। এই রোগটি আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু কেড়ে নিচ্ছে। কবে আগের মতো দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে পারবো তা জানি না, তাও আশা রাখি আবার আমরা সবাই খোলা আকাশের নিচে নির্দ্বিধায় বেরোতে পারবো, বাচ্চারা মাঠে খেলতে পারবে, সব ছাত্রছাত্রী স্কুল, কলেজে যেতে পারবে, বেকার কর্মচারীও শ্রমিকরা কাজ পাবে। কিন্তু লকডাউন সম্পূর্ণ উঠে গেলেও আমাদের দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। আবার কোভিড ১৯ এ যেমন ক্ষতি হয়েছে ঠিক তেমনি একটা ভালো দিক দেখিয়েছে আমাদের। আমরা এতদিন নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের কাজের ব্যস্ততার মধ্যে থাকতাম তাই কোভিড ১৯-এর ফলে লকডাউনে আমরা ঘরবন্দী অবস্থায় নিজের পরিবারের সাথে সময় কাটাতে পারছি । এখনো কোভিড ১৯ এর কোনো ভ্যাকসিন বেরোয়নি; তাই আমরা যদি নিজেরা ডাক্তারের পরামর্শ মতো সব নিয়ম মেনে চলি তাহলে নিজে এবং নিজেদের পরিবারকে এই মারণ ব্যাধি কোভিড ১৯ এর কালোছায়া থেকে দূরে রাখতে পারবো। তাই আমাদের নিজেদের সর্তক হতে হবে এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হবে। আগামী দিনে যাতে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসতে পারি। কারণ সব অন্ধকারের শেষে ঠিক আলো আসবেই।

প্রকৃতির প্রতিশোধ

দিশা দাস । সেমেস্টার ২

শোনা গেছে ২০২০ সালটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন প্রহরের মতো। তার প্রমাণ আমরা পাই বছরের প্রথম থেকেই। কেননা, দাবানলের ত্রাসে প্রকাণ্ড ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী হয়ে উঠেছিল অস্ট্রেলিয়া। প্রকাশিত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি প্রায় ৫০ কোটি প্রাণীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর এই নির্মমতার খেলা এখানেই শেষ নয় বরং শুরু বলা যেতে পারে।

এর কিছু দিন পর বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটে আর এক মারণ রোগের। প্রকৃতির আর এক রোষের নাম হিসেবে পরিচিত হয় করোনা (Covid-19)। এটি এমনই এক প্রকার অণুজীব যা চোখে দেখা সম্ভব নয়। এই অণুজীব যদি কারো শরীরে প্রবেশ করে তবে তার শ্বাসযন্ত্র অর্থাৎ ফুসফুস ও কিডনি দুই বিকল করে দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটে।

এই ভাইরাসটির সর্বপ্রথম উদ্ভব ও প্রসার ঘটে চীনে। ধীরে ধীরে গোটা বিশ্বে ছেয়ে যায় তার ঘন কালো ছায়ায়। অনেকের মতে, এটা ছিল একটি সুপরিকল্পিত চিন্তা ভাবনার পরিণতি।

দেশে প্রথম লকডাউন হয় ২৪শে মার্চ। আর সেই প্রথম আমার মতো অনেকেই লকডাউন কিংবা কোয়ারেন্টাইনের মতো কিছু শব্দের সাথে পরিচিত হই। প্রথম প্রথম সবাই ভেবেছিল, কয়েকটা দিন ঘরে থাকাটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। বরং অনেকদিন পর বাড়ির প্রিয় মানুষজনের সঙ্গে সময় কাটানো যাবে। পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা, নাচ-গান, ছবি-আঁকা ইত্যাদি নানান কাজে কাটিয়ে দেবে সময়। ভাবনাটা যে একেবারে ভুল ছিল তা নয়। কেননা, এই সময়ে বেড়ে গেছে ফেবুকবিদের সংখ্যা— ফেসবুকে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁরা লিখে থাকেন। এটা অবশ্যই ভালো বিষয়। কিন্তু সমস্যা হলো— খারাপ লেখালেখির তলায় চাপা পড়ে যায় কিছু ভালো লেখা। যাই হোক, যে কথা বলছিলাম— দীর্ঘদিন ঘরে বন্দীদশায় আমাদের কিন্তু দমবন্ধ করা অবস্থা। বহু মানুষ আছেন যাঁদের উপার্জন বন্ধ হয়ে গেছে। কষ্টের সীমা নেই তাঁদের। ছাত্রছাত্রীরা স্কুল-কলেজে যেতে পারছে না। ভবিষ্যতের পরিণতি কী হবে অনুমান করা যাচ্ছে না কিছুই। ডিপ্রেশনের শিকার হচ্ছে মানুষ। পারিবারিক ও মানসিক সমস্যায় জর্জরিত কেউ কেউ। অসহায় এক সময়ের মধ্যে হেঁটে চলেছি আমরা।

তবুও এরই মধ্যে আশার আলো বলতে প্রকৃতি আগের চেয়ে অনেকটাই সুস্থ, দূষণমুক্ত হয়ে চলেছে। লকডাউনের জন্য যানবাহনের ব্যবহার কমায় বায়ুদূষণ কমেছে। আকাশের রঙ হয়েছে আরও বেশি উজ্জ্বল। এখন শুনতে পাওয়া যায় পাখিদের কাকলি যা এই দূষিত পরিবেশের মধ্যে হারিয়ে যেতে বসেছিল। লকডাউনের জেরে অনেক কলকারখানা বন্ধ থাকায় বাতাসে ধোঁয়ার পরিমাণ কিছুটা কমেছে। দূষণের কারণে ওজোন স্তরে যে ছিদ্র দেখা গিয়েছিল তার অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে আসছে। এখন গড় বৃষ্টির পরিমাণও বেড়েছে। অনেক বিলুপ্ত প্রাণীর দেখা মিলছে পুনরায়। মানুষ আজ ঘরে বদ্ধ হয়েছে বলেই হয়তো পশুপাখিরা অবাধে বিচরণ করার সুযোগ পেয়েছে।

২০২০ সাল কতটা ভালো বা খারাপ তা হয়তো আমরা ঠিক বলতে পারবো না বা তর্ক বিতর্কে এর সমাধান পাওয়া মুশকিল। লকডাউনের ফলে করোনা কতটা কমবে জানা নেই। কিন্তু এর থেকে শিক্ষা নিয়েএটুকু বলা যায়, প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করা কখনোই উচিত নয়। নইলে প্রকৃতির রোষানল থেকে মানব জাতির বাঁচা অসম্ভব। আশা রাখি, এই দুঃসময় তাড়াতাড়ি কেটে যাবে এবং পরিবেশ হয়ে উঠবে সুস্থ ও স্বাভাবিক।

আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি

রিয়া ঘোষ । সেমেস্টার ২

আজ বিশ্ব প্রায় একটি অকল্পনীয় অতিমারীর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তার নাম করোনা প্যান্ডেমিক। ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকালে ইউরোপের ব্ল্যাক ডেথ বা ইউরোপিয়ান প্লেগও হয়তো এতটা ত্রাস সৃষ্টি করেনি মানবসমাজে যতটা করেছে এই করোনা ভাইরাস। আর প্রতিটা বছরের মতোই আমরা নবযৌবনে এবং নব উদ্যমে শুরু করতে চেয়েছিলাম এই দুই হাজার কুড়ি সালটা। কিন্তু নিয়তির এমনই লিখন যে আজ প্রায় পাঁচ মাস হয়ে গেল সমগ্র বিশ্ববাসী গৃহবন্দী। হ্যাঁ গৃহবন্দী, তার কারণ এই ধ্বংসাত্মক ভাইরাসের কোন প্রতিষেধক এখনো অবধি আবিষ্কার করতে পারেনি চিকিৎসক-গবেষকরা। আমরা শুধু এই জীবাণু থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি কিন্তু এটি দ্বারা আক্রান্ত হলে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এর চিকিৎসা নেই। তাই দেশের এবং দেশের স্বার্থে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশেই উন্নত হোক বা উন্নয়নশীল কিংবা অনুন্নত সবাই জারি করেছে এক বিচিত্র কার্ফু, যার নাম লকডাউন।

এই লকডাউনে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা করা, আলিঙ্গন করা, এমনকি স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, প্রাত্যহিক কাজও বন্ধ। এই কোভিদ ১৯ দেখিয়ে দিয়েছে যে সামাজিকতা আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। বিংশ শতকের মানুষ এগিয়ে চলেছিল এক ভার্চুয়াল আত্মকেন্দ্রিক জীবনের দিকে, সমাজ থেকে বহু ক্রোশ দূরে। কিন্তু আজ যখন আমাদের কাছে অখণ্ড অবসর রয়েছে তখন ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, টুইটারে রীতিমতো অভক্তি এসে যাচ্ছে। এর কারণ আমরা কি কোথাও আমাদের মানববন্ধনের অনুপস্থিতি অনুভব করছি না? অবশ্যই করছি।

আজ গোটা দেশের মানুষ একে অপরের থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন; যেটুকু আলাপ হচ্ছে তাও টেলি মাধ্যমে। হয়তো এই যে শূন্যস্থান মানুষে মানুষে তৈরি হয়েছে তা হয়তো আরো শক্ত ভাবে জোড়া লাগবে এই অতিমারীর শেষে। প্রতি শহরে-গ্রামে লাখো লাখো মানুষ মারা যাচ্ছে একথা অস্বীকার করা যায় না। আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ড, রাশিয়া থেকে ইতালি এমনকি ভারতেও চিত্রটা একই। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা কবিতার লাইন এই প্রসঙ্গে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ**"মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াও"**। এই সময়টা মানুষ হওয়ার, মানুষ হয়ে অন্য আর্থিক সংকটে দীর্ণ গরিব মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর। সরকারি ত্রাণ তহবিল সমবায় তো আছেই, কিন্তু যে সব মানুষ এই লকডাউনে নিজেদের কাজ হারিয়েছে, যে সব পরিযায়ী শ্রমিকরা তাদের কাজ ফেলে নিজেদের নিজেদের গ্রামে ফিরতে বাধ্য হয়েছে তাদের রোজগারের সংস্থান নেই। তাহলে কি এটা সমাজবদ্ধ দায়িত্বশীল মানুষের কাজ নয় যে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াই? এমনকি শুধু মানুষ নয়, পথের কুকুরটিও যেন অভুক্ত না থাকে সেটা দেখাও আমাদের কর্তব্য। মানবিকতার পরীক্ষা যেন চলছে এই লকডাউনে।

কবি শঙ্খ ঘোষের লেখা **"আয় আরও বেঁধে বেঁধে থাকি"** কবিতাটিতে তিনি বারংবার দুর্যোগ, বিপর্যয় যুদ্ধবিগ্রহের এই বীভৎস অবস্থায় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছেন। কবিতাটির বাস্তব ভিত্তি হয়তো আজকের এই দিন, যেদিন মানুষ বড় অসহায়। সীমান্তে যুদ্ধ, শহরের পর শহর শ্মশানে পরিণত হচ্ছে, রাজনৈতিক সংঘর্ষের পাশাপাশি চলছে ধর্মীয় দাঙ্গা।

নিজেদের এবং পরিবারের স্বার্থ এবং সুরক্ষার জন্য বাড়িতে থাকতে হবে এটাই দস্তুর। আজকের বিশ্বায়নের যুগে নেটের দৌলতে পড়াশোনা, অফিস-আদালতের

এরপর এগারো পাতায়

আমরা জানি একদিন এই দুর্যোগ কেটে যাবে। পৃথিবী আবার আগের মতো নিত্যনৈমিত্তিক গতিতে এগিয়ে চলবে। দেখা হবে আপনজনদের সাথে। কল্লোলিনী তিলোত্তমা আবার আনন্দের শহর হয়ে উঠবে।

দশের পাতার পর

অমেক কাজই আজ আমাদের আয়ত্তে। সেই কাজগুলো আমাদের যথাসম্ভব নিষ্ঠাভরে সম্পন্ন করা উচিত। এই লকডাউন আমাদের সেটাই শেখাচ্ছে, আরো দৃঢ় হচ্ছে আমাদের আশার আলো, হয়তো সেদিন আর বেশি দূরে নেই। সুস্থতার হার বাড়ছে। ইতিমধ্যে আনলক এর প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে ভারতে। ধীরে ধীরে দোকান, বাজার, কফি হাউস, তারাপীঠ, কালীঘাটের মতো তীর্থক্ষেত্রগুলো খুলে যাচ্ছে। বর্ষ প্রাচীন পুরীর রথযাত্রা নিষ্ঠাভরে পালিত হয়েছে মন্দিরের সেবায়েতদের দ্বারা। তবে ভুলে গেলে চলবে না কোন সংকট এখনো যায়নি, সশরীরে বিদ্যমান। শুধু মাস্ক বা স্যানিটাইজার এবং সোশ্যাল ডিসটেন্স মানাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিন্তু মানসিক দূরত্ব নয়। গৃহবন্দী দশায় অনেকেরই পরিবারকে না দেওয়া সময়ের আক্ষেপ, ধুলো পড়া গিটারের গুঞ্জন, ডায়েরির পাতাগুলো ভরাট হয়ে উঠেছে, নিজেকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করতে শিখছে মানুষ। প্রাত্যহিক জীবনে কলের যন্ত্রের মতো জীবন থেকে কিছুটা সরে এসে নিজেদের শখ-আহ্লাদ এবং ভালোবাসাগুলোকে যত্ন করতে জেনেছে।

আমরা জানি একদিন এই দুর্যোগ কেটে যাবে। পৃথিবী আবার আগের মতো নিত্যনৈমিত্তিক গতিতে এগিয়ে চলবে। দেখা হবে আপনজনদের সাথে। কল্লোলিনী তিলোত্তমা আবার আনন্দের শহর হয়ে উঠবে। তবে এর মধ্যে আমরা যেন এই অভিজ্ঞতা এবং অভ্যাসকে বিসর্জন দিয়ে না দিই, সেটাই অভিপ্রেত। পেশাগত জীবনের পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনটা মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; সেটাকে অবহেলা করা একদমই উচিত নয়। তাই অতিমারী থেমে গেলেও এবং লকডাউন উঠে গেলেও সযত্নে আমাদের শখ-আহ্লাদ এবং পারিবারিক বন্ধন ক্রমশ লালিত হয়েছে এই কয়েকদিনে তাকে দৃঢ় করে তোলার কাজে সচেষ্ট থাকা উচিত।

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো

রেমা দাস । সেমেস্টার ৪

'লকডাউন' শব্দটার সঙ্গে পরিচয় প্রায় মাস চারেকের। মারণ রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য গৃহবন্দী মানুষ। বাজারহাট, দোকানদারি বন্ধ। পরিবহন ব্যবস্থা অচল। অখণ্ড অবসর। আর ঠিক এই সময়ে নিজেকে নতুন করে চেনা আর কিছু সুন্দর মুহূর্ত যাপন— এই নিয়েই আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা বলতে চলেছি।

"বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম দুটি নয়ন মেলে।
পরশ যাঁরে যায়না করা সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ করে দিন তাই
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই ।।"(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রকৃতির এক অন্যরূপের প্রকাশ পাওয়া গেছে। দূষণের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত হয়ে প্রকৃতি আজ অনেকটাই স্বমহিমায় বিরাজ করছে। পাখির সংখ্যা বেড়েছে। বাতাস অনেক নির্মল। গতিশীল জীবন থমকে গিয়ে জীবনকে দেখার চেষ্টা বেড়েছে।

মানুষজনকে দেখেছি— সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেও একজন আরেকজনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। করোনার প্রকোপে আমরা সবাই গৃহবন্দী। স্বভাবতই আমরা আমাদের পরিবারের অনেক কাছে থাকার সুযোগ পেয়েছি। একঘেয়ে ব্যস্তজীবনে বলা যেতে পারে হঠাৎ আনন্দের দিশা খুঁজে পাওয়া। পরিবারের সকলের সাথে সময় কাটানোর এক অন্যরকম অনুভূতি। তার কাছে পরিবার হলো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যেখানে সে তার সুখ দুঃখের কথা, তার হাসি-কান্না ভাগ করে নেয়। লকডাউনে কলেজ বন্ধ থাকায় তেমন কোনো বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পাইনি। সেই সুবাদে দিনের বেশিরভাগ সময় পরিবারের সাথে কাটিয়েছি। আমাদের এই প্রজন্ম যে লকডাউন দেখলো, বিশেষ করে আমার মতন কলেজ-ছাত্রছাত্রীরা, আমরাও যেমন সুযোগ পেলাম নিজেদের কে চেনার, নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সাথে মতামত আদানপ্রদান করার, সত্যিই তা সারাজীবন

এরপর বারো পাতায়

এগারো পাতার পর

মনে রাখার বিষয়। সত্যি বলতে লকডাউন আমার মন্দ কাটলো না।

গত চার মাস পেরিয়ে আজকের দিনে আমার উপলব্ধি এটাই যে নিয়মানুবর্তিতাই হল জীবনের অন্যতম রসদ । এরপরেই অভ্যাসের কথা বলতে হয়। কেননা, অনভ্যাসে অনেক সম্পদ নষ্টও হয়ে যায়। যার উদাহরণ স্বয়ং আমিই। ছোটবেলায় আঁকা নিয়ে একটু চর্চা করতাম। এই ব্যস্ত জীবনের মাঝে তা যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম। তবে কিছুদিন হল একসময়ের আমার সবচেয়ে পছন্দের বিষয় আঁকার চর্চায় মন দিয়েছি। যেন পুরোনো স্মৃতির মাঝে একটুকরো আলো। এই অজুহাতে নিজেকেই নিজে সেরা শিল্পী সম্মান দিয়েছি বহুবার। নানারকম আঁকার চেষ্টা করি মাত্র এই যেমন— Invert art, Mandala art, Doodle art, Acrylic art । সব মিলিয়ে জীবন এখন নতুন এক ছন্দে চলেছে।

বাইরের আলো নিভে গেলে অন্তরের আলো প্রজ্জ্বলিত হয়। লকডাউনের কারণে যেহেতু ট্রেন চলাচল বন্ধ— এই চার মাসে আমি আমার সমাজটাকে, আমার পাড়াকে ভালো করে লক্ষ্য করার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের চারপাশের মানুষজনকে যেমন লকডাউন মানতে দেখেছি তেমনই লকডাউনের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে এমন অবিবেচক মানুষদেরও দেখেছি। লকডাউন ঘোষণা হলে অনেকেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসপত্র কেনার জন্য বাজারে ছুটেছে। যেন বাজার আর খুলবে না। ফলে বাজারে ভিড় বেড়েছে। সাধারণ ভাবে জমায়েত হওয়ার জায়গাগুলোকে সরকারের নির্দেশে বন্ধ রাখার কথা বলা হলেও অনেকেই তা মানেননি।

করোনার মোকাবিলায় মানুষ শিখেছে পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা কাকে বলে! এই পরিচ্ছন্নতাই কীভাবে আরোগ্য বা সুস্থতা এনে দিতে পারে তা বুঝতে পারছে মানুষ। মানুষের স্বাস্থ্য-সচেতনতাও বেড়েছে। মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, গ্লাভস্ ইত্যাদি ব্যবহারের প্রয়োজনীতা অনুভব করছে সবাই। ‘Post Pandemic World’ পড়ে ব্যক্তিগত ভাবে আমি আশাবাদী যে বিজ্ঞান আরও উন্নতির পথে এগোবে—যেমন প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসক, পুলিশ যাঁরা অনবরত এই করোনার মোকাবিলায় আমাদের পাশে সর্বদা আছেন, আমাদের প্রতিনিয়ত সতর্ক করে যাচ্ছেন তাঁদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

আশা করি তাড়াতাড়ি ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হবে। করোনামুক্ত হবে পৃথিবী। বন্দীদশা কেটে যাবে। কলেজে যাবো। স্যার ম্যাডামদের ক্লাস করবো। দেখা হবে বন্ধুদের সঙ্গে। ঈশ্বরের কাছে একটাই প্রার্থনা— আমার এই ইচ্ছাপূরণ যেন তাড়াতাড়ি হয়।

অবাক পৃথিবী

নয়না কুন্ডু । সেমেস্টার ২

সম্ভবত বিগত বছরের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে আমরা ‘নভেল করোনা ভাইরাস’ অথবা কোভিড ১৯-এর খবর শুনতে পাই চিন থেকে। তখন কেউ হয়তো ধারণাও করতে পারেনি যে এই মারণ ভাইরাসে এত প্রাণহানি ঘটবে, লক্ষ-লক্ষ মানুষ স্বজনহারা হবে। যে ভাইরাস নাকি হাওয়ায় ভাসে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী প্রায় ১৩০কোটি জনসংখ্যাসম্পন্ন দেশ ভারতবর্ষের বেশিরভাগ মানুষ তখনও অব্দি জানতোই না যে আমাদের প্রতিবেশী দেশে এই রোগ এত ভয়াবহতা তৈরি করেছে। তখনও অব্দি আমরা জানতামও না হবে লকডাউন আসলে কী। আজও মনে আছে সেই দিনটা ২২শে মার্চ ২০২০যেদিন সমগ্র বিশ্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ‘জনতা কার্ফু’ জারি করেছিলেন। আমার খুব কাছের বন্ধুর মা-ও সেদিন মারা যান। কিন্তু এই কারণ বশত আর দেখা করতে যেতে পারিনি। ফোন করেই খবর নিচ্ছিলাম। আমি নিজে ভারতবর্ষের অন্যতম জনপ্রিয় শহর কলকাতার অধিবাসী। অন্যতম ব্যস্ত শহর হিসাবে পরিচিত এই শহরে একদিন কার্ফু মানে অনেক ক্ষতি. যারা দিন আনি দিন খাই, তাঁদের যে সেদিন উনুন জ্বলবে না তাবুঝতে পেরেছিলাম; তবে এটা যে কেবল এক দিনের হয়রানি নয়, এর থেকেও বেশি কিছু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল তা বুঝতে পারিনি। ইতিমধ্যে সেই মারণ ভাইরাস চীনকে ছাপিয়ে পৃথিবীর অন্য**দেশ** গুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিলএবং আমাদের দেশও সেই পরিসংখ্যানের বাইরে নয়। প্রথম থেকেই আমেরিকা বেশি আক্রান্ত হয়েছিল।

কলকাতায় প্রথম এই রোগের হদিস মেলে বিলেত ফেরত আমলা পুত্রের শরীরে। তারপর এক এক করে লকডাউন মানুষের স্বাভাবিক জীবনটাকে নাড়িয়ে দিয়েছিলো। মানুষের জীবনযাত্রা ছন্দোহীন হয়ে পড়ে, অনেক অনেক মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ে। আমি নিজে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত এক কলেজের ছাত্রী। নতুন সিলেবাস অনুযায়ী আমাদের রেগুলার কলেজ যাওয়া আর ক্লাস অ্যাটেন্ড করা খুব প্রয়োজন। সেই জায়গায় হঠাৎ করে এই লকডাউনের কারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে আমাদের রোজকার জীবনও অনেকটা গতিহীন হয়ে পড়েছে। তবে এই লকডাউনের ফলে আমার অনেক ক্রিয়েটিভ দিক আমি ফেরত পেয়েছি। ফোন দেখে টুকটাক ঘর সাজানোর জিনিস বানানো, মায়ের হাতে হাতে কাজ করা, নতুন নতুন রান্না করা, সেলাই করা এবং পাশের বাড়ির দাদার থেকে গিটার শেখা, সময়ের অভাবে যে তা হয়ে উঠতো না। আর সব থেকে বেশি ভালো হয়েছে যে বাবা-মা যেহেতু দুজনেই কর্মরত তাই তাঁদের সাথে অনেকটা করে সময় কাটাতে পারছিলাম।

এই সব কিছু ভালোর মধ্যেও হু-হু করে মানুষ আক্রান্তের সংখ্যাটাও বেড়েই চলছিল। আমেরিকা প্রায় শ্মশানে পরিণত হচ্ছিল, এছাড়াও অন্যান্য দেশের একই অবস্থা। ডাক্তার-বিজ্ঞানী রাত দিন চেষ্টা করেও এর সুরাহা করে উঠতে পারছিলেন না।মানুষ যেমন আক্রান্ত হচ্ছে, তেমন মারাও যাচ্ছে, আবার সুস্থও হচ্ছে অনেকে।কত মানুষ যে স্বজনহারা হয়েছে তার ঠিক নেই। আর এই সবের মধ্যেই ২০শে মে-এর **আমপান ঝড়** পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের মানুষকে আরো নাড়িয়ে দিয়েছিল।

একদিকে মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছিল; সেখানে এই ঝড়ের পর হাজার হাজার মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছিল, উপকূল এলাকার অনেক জায়গাতেই বন্যা হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে অন্যান্য রাজ্যে কর্মরত মানুষেরা পায়ে হেঁটেই বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করতে থাকেন যার ফলে অনেক মানুষ খিদে-তেষ্টায়, ঘুমের কারণে ট্রেনে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। অনেক প্রসূতি মা শিশু প্রসব করার ঘন্টা খানেকের মধ্যে আবার হাঁটা শুরু করেছেন বাড়িতে ফেরার কারণে।

এই সব কিছু খারাপের মধ্যেও একটা ভালো হলো যানবাহন না চলার দরুন পরিবেশ অনেকটাই দূষণ মুক্ত হয়েছে, পৃথিবীর মানুষ আবার এক দূষণমুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেবে। তবে সমগ্র বিশ্ববাসীর এখন একটাই চাওয়া এক **করোনা মুক্ত পৃথিবী**। সবার মনে রাখা উচিত আমাদের রোগের সাথে লড়তে হবে, রোগীর সাথে নয়। তাই নিজেদের সচেতন থাকতে হবে আর অন্যদের সচেতন করতে হবে। সুস্থ মানসিকতার পরিচয় দিতে হবে।

লকডাউনের ফলে আমার অনেক ক্রিয়েটিভ দিক আমি ফেরত পেয়েছি। ফোন দেখে টুকটাক ঘর সাজানোর জিনিস বানানো, মায়ের হাতে হাতে কাজ করা, নতুন নতুন রান্না করা, সেলাই করা এবং পাশের বাড়ির দাদার থেকে গিটার শেখা, সময়ের অভাবে তা হয়ে উঠতো না।

পৃথিবী আবার শান্ত হবে

অর্পিতা গাঙ্গুলী। সেমেস্টার ২

শুধু আমি একা নই, ভারতবর্ষের প্রায় সবাই আজ গৃহবন্দী। মারণ ভাইরাস করোনার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, বন্ধ দোকানপাট। মানুষের জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হচ্ছে। ভিড় এড়িয়ে চলছে মানুষ। সারা বিশ্ব জুড়ে চলছে হাহাকার। মনে পড়ে যাচ্ছে কবি জীবনানন্দ দাশের 'সুচেতনা' কবিতার কথা:

"পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন,
মানুষ তবুও ঋণী এই পৃথিবীরই কাছে।"

সত্যি, মানুষ আজ বড়ো অসহায়। আজ এই করোনা-আবহে মানুষকে সচেতন থাকতেই হবে। শুধুমাত্র নিজের জন্য নয়, সবার জন্য আজকে মানুষের পাশে মানুষকেই দাঁড়াতে হবে। বিপদে মানুষই তো মানুষের পাশে দাঁড়ায়। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'দাঁড়াও' কবিতায় ঠিক এমনই বলেছিলেন—

"মানুষ বড় কাঁদছে
তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও।"

আজ এই মারণ রোগটা হয়তো আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেলো। সব থেকে বেশি যেটা শিখিয়ে গেল— মানুষ কখনও একা বাঁচতে পারে না। জানি না, আগামী দিনে পরিবেশ কেমন হবে, মানুষ আবার কবে আগের মতো স্বাভাবিক জীবন ফিরে পাবে। কিন্তু এটা বুঝেছি, এই করোনা, মানুষের ভেদাভেদ, হিংসা, দলাদলি সব যেন এক লহমায় ভেঙ্গে দিয়ে গেল। এই পরিস্থিতিতে এখন প্রতিটি মানুষ শুধু বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। অন্যান্য রাজ্যের মতো আমাদের রাজ্যেও অনেকে আজ এই মারণ রোগের শিকার। আমরা জানি, এই রোগ থেকে নিরাপদে থাকার জন্য মানুষকে ঘরে বন্দী দশায় থাকতে হবে। কিন্তু তা কতদিন? রুজি রোজগারে টান ধরলে তো মানুষকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেই বাইরে বেরোতেই হবে। কত মানুষ চাকরি হারিয়েছেন। অথবা, কাজ হারিয়েছেন সাধারণ মানুষ। আজকে তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের প্রত্যেকের এগিয়ে আসা খুবই প্রয়োজন।

প্রথম যখন রাজ্যে লকডাউন শুরু হয় তখন বন্ধুদের বলেছিলাম, কীভাবে এতোদিন ঘরে বন্দী থাকব— দম বন্ধ হয়ে আসবে না? কিন্তু সেই আমিই এখন দিব্যি একটানা তিন মাস বাড়িতে বসে কাটিয়ে দিলাম। আবার এমনও মনে হয়েছে— আগে ভাবতাম, মা ঘরে থাকে, বাইরে বেরোনোর সুযোগ তার নেই। এখন মায়ের কষ্টটা অনুভব করতে পারি সহজেই। একদিন চিড়িয়াখানায় গিয়ে খাঁচায় বন্দি পশু পাখিদের দেখে আনন্দ করেছি। তখন তাদের কষ্ট, একঘেয়েমি বোঝার চেষ্টা করিনি। তখন শুধু নিজেরটুকুই বুঝতাম। এখন বুঝতে পারি বন্দিদশার কষ্ট কতখানি। যখন মুক্ত আকাশে পাখিরা নিজের খেয়ালে উড়ে চলে, জানালা দিয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি আমি। মনে মনে আমিও ওদের সঙ্গে উড়ে যাই। তাই ঘরের জানালাটাই এখন আমার কাছে আস্ত একটা দুনিয়া।

বাড়ির ছাদে ফুলের টবগুলোয় প্রতিদিন জল দিই। ফুলগাছগুলো নিয়মিত জল পেয়ে বেড়ে উঠছে আর আমার মনও হয়ে উঠছে উৎফুল্ল। লকডাউনে মোবাইল ফোনের সাহায্যেই পড়ে ফেলেছি বেশ কিছু ছোটগল্প, উপন্যাস। গোয়েন্দা গল্প, প্রফেসর শঙ্কু তো আছেই। অনলাইন ক্লাস, পড়াশোনা সবই হচ্ছে, তবে কলেজে গিয়ে পড়ার মজাটা পাচ্ছি না। বন্ধুদের সঙ্গে ফোনে লুডোখেলা, কথা বলা, গান শোনা সবই হচ্ছে কিন্তু কলেজকে মিস করছি খুব। কলেজের ওই বাড়িটাকে এতো ভালোবাসি বুঝিনি আগে। দেখতে দেখতে প্রায় তিন-চার মাস কেটে গেল। এখনও অপেক্ষার অবসান ঘটেনি। তাও মন আমার আশার আলো দেখে আর বারবার বলে ওঠে— কবে দেখা হবে সবার সাথে, ঠিক আগের মতো।

যখন রাজ্যে লকডাউন শুরু হয় তখন বন্ধুদের বলেছিলাম, কীভাবে এতোদিন ঘরে বন্দী থাকব— দম বন্ধ হয়ে আসবে না? কিন্তু দিব্যি একটানা তিন মাস বাড়িতে বসে কাটিয়ে দিলাম। আবার এমনও মনে হয়েছে— আগে ভাবতাম, মা ঘরে থাকে, বাইরে বেরোনোর সুযোগ তার নেই। এখন মায়ের কষ্টটা অনুভব করতে পারি সহজেই।

নিজেকে জানলাম

শ্রীপর্ণা ব্যানার্জী। সেমেস্টার ২

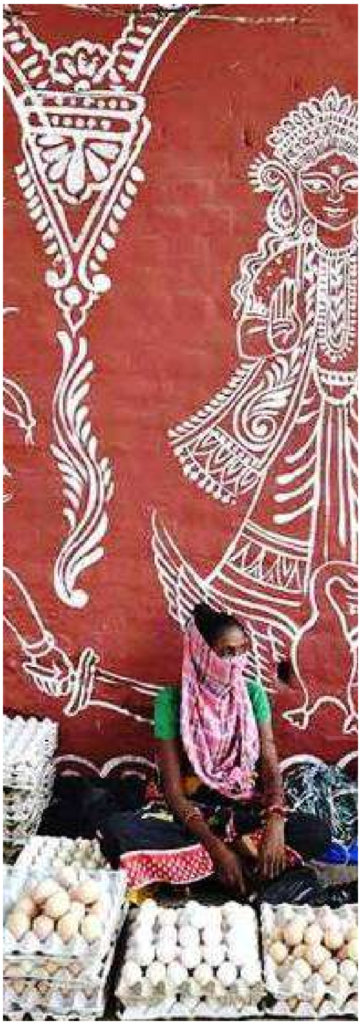

২৩ শে মার্চ খুবই উৎকণ্ঠা নিয়ে বসেছিলাম টিভির পর্দায় চোখ রেখে। করোনা ভাইরাস সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এমত অবস্থায় লকডাউন ছাড়া কোনো উপায় নেই। এশিয়া ইউরোপ আমেরিকায় দফায় দফায় রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং সেই সঙ্গে মৃত্যুর হারও। আমি প্রথম বর্ষের ছাত্রী। বন্ধু বান্ধব নিয়ে আমাদের এক নতুন জগৎ। আমরা সবাই মিলে ক্লাস করি, সবাই মিলে সবার খাবার ভাগ করে খাই। সব বন্ধুরা যেন সবার কাছে কত আপন। এই অবস্থায় লকডাউন। আমি ভেবেছিলাম হয়ত কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকবে সবকিছু; আবার সবার সাথে দেখা হবে, নতুন করে ক্লাস শুরু হবে। কিন্তু না। যখন একটানা এক নিয়মে বাঁধা জীবন যাপন করছিলাম তখন মনে হতো রবিবারটা কেন প্রতিদিন আসে না। প্রতিটি দিনই যদি ছুটির দিন হতো তাহলে কত মজা হতো। এরকম মনে হওয়ার পেছনে প্রথম কারণটি হল রবিবারটাই এমন একটা দিন যেদিন আমি মা বাবা আমরা সবাই মিলে এক সাথে বসে গল্প করতে পারি। একসঙ্গে একই টেবিলে বসে খাবার খেতে পারি। তিন জনে মিলে বিকেল বেলায় বেড়াতে যেতে পারি। যেহেতু প্রতিদিন আমার কলেজ আর আমার বাবার অফিস থাকে সেহেতু অন্যান্য দিনগুলোতে আমার আর বাবার সারাটা দিন একসাথে থাকা হয়ে ওঠে না। তাই রবিবারটা আমার কাছে খুবই মজার একটা দিন। সারাটা দিন আমি খুব আনন্দ উপভোগ করতাম। তাছাড়াও আত্মীয়স্বজন বাড়ির বন্ধু বান্ধব সবার সাথে আড্ডা দিতে পারি। সব মিলিয়ে খুব খুশির একটা দিন। তাই ভাবতাম রোজই যদি রবিবার কতই না ভালো হতো। কিন্তু আজ যখন সত্যি সত্যি এরকম কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হলাম তখন বুঝতে পারলাম যে রবিবারটা সপ্তাহে একটা দিন আসে বলেই এত মজা হয়। প্রতিদিন যদি রবিবারের মতো ছুটির দিন হয় তাহলে এই মজাটাই শাস্তিতে পরিণত হয়। প্রথম কয়েকটা দিন ভালোই কাটছিল কিন্তু যতদিন এগুচ্ছে, ততই যেন সেই আগের নিয়মে বাঁধা দিনগুলির কথা ভীষণভাবে মনে পড়তে থাকছে। এখন মনে হচ্ছে সেই ধরা বাঁধা দিনগুলোই যেন আবার জীবনে ফিরে আসে খুব তাড়াতাড়ি। এখন তো আমাদের লড়াই এক ভাইরাসের সাথে। সারাক্ষণ মনের মধ্যে ভয় হতে থাকে যে এই ভাইরাস বুঝি আর শরীরেও বাসা বাঁধলো এবং আমার থেকে আমার কাছের মানুষগুলির মধ্যে। তবে এই কথাটাই সত্যি যে এই ভাইরাসটি আমাদের জীবনে না এলে আমি এটা জানতেই পারতাম না যে আমি সুন্দর করে গুছিয়ে কাজ করতে পারি। অনেক ছোট ছোট কাজ যেগুলো কখনই করিনি সেই কাজগুলো করতে শিখেছি। এবং সময়ের মূল্যটা বুঝেছি। এটা একটা বড়ো প্রাপ্তি আমার কাজটা ছাড়াও আর একটা খুব মজার জিনিস শিখেছি, সেটা হল রান্না। আগে কখনই রান্নার ঝোঁক আমার ছিল না। কিন্তু এই লকডাউনে একটানা বাড়ির মধ্যে থেকে থেকে মায়ের থেকে কিছু শখের রান্না শিখে নিয়েছি। মা বাবা যখন সেই রান্না খেয়ে প্রশংসা করে বা কোনো অতিথি বাড়িতে এলে রান্না করে খাইয়ে সে যখন আমার রান্নার প্রশংসা করে তখন মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। নিজের এই সুন্দর অনুভূতি এবং আনন্দটা আমার জীবনে অধরাই থেকে যেত যদি না লকডাউন শব্দটির সঙ্গে পরিচয় ঘটতো। তাই অনেক খারাপের মধ্যে এই ভালোকে আমি খুঁজে পেয়েছি। তবে আমার বিশ্বাস আমরা খুব শীঘ্রই নতুন সূর্যোদয় দেখতে পাবো।

দোকান বাজার শপিংমল, কারখানা সব বন্ধ হয়ে গেছে, কত মানুষের জীবনজীবিকা আজ প্রশ্নের মুখে। কত মানুষ কাজ হারিয়েছে। লকডাউনের ফলে দূষণযুক্ত বাতাস কোথায় যেন দূরে চলে গেছে। সবটাই যেন মনে হয় নতুন করে ফিরে পাচ্ছি। সবুজ পাতা যেন ময়ূরের মতো পেখম তুলে ধরেছে। বন্য পাখিরাও যেন আস্তানা খুঁজে পাচ্ছে। দক্ষিণ নির্মল বাতাস আজ বইছে। গরমের হাঁসফাঁস অনেকটাই কম।

ভারত অধ্যাত্মবাদের দেশ। এখানে জন্মেছেন রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ প্রমুখ। তাঁদের আদর্শ আমাদের চলার পথের শক্তি যোগায়। তাই ভারতবর্ষে কখনই প্রলয় মহামারী চিরস্থায়ী হবে না। আমার বিশ্বাস আমরা করবো জয়। আমরা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও জয়ী হবো। কারণ মানুষের শক্তিতে আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরশীলতা রয়েছে। কোনো অবস্থাতেই আমরা হেরে যাব না।

একটা খুব মজার জিনিস শিখেছি, সেটা হল রান্না। আগে কখনই রান্নার ঝোঁক আমার ছিল না। কিন্তু এই লকডাউনে একটানা বাড়ির মধ্যে থেকে থেকে মায়ের কাছে কিছু শখের রান্না শিখে নিয়েছি। মা বাবা যখন সেই রান্না খেয়ে প্রশংসা করে বা কোনো অতিথি বাড়িতে এলে রান্না করে খাইয়ে সে যখন আমার রান্নার প্রশংসা করে তখন মনটা আনন্দে ভরে ওঠে।

গৃহবন্দীর স্বীকারোক্তি

মৌমিতা সর্দার । সেমেস্টার ৪

জীবনের এমন কিছু অকল্পনীয় বাস্তব সামনে আসে যা ক্ষণিকের অতীতকে ইতিহাস বানিয়ে তোলে। ঠিক এমনই এক দুঃস্বপ্নময় সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে বিশ্লেষণ করা প্রবন্ধের মতো কঠিন। যা কাল পর্যন্ত সচল ভাবে প্রাণসঞ্চয় করছিল সকল প্রাণে তা আজ নিষ্প্রাণ, স্পন্দনহীন ভাবে থামিয়ে রেখেছে সব কিছু। না, একদিন-দু'দিন নয়, প্রায় চার মাস ধরে নিজেকে অনেক অভিজ্ঞ করে তুললাম, সামাজিক, মানসিক ও সহনশীলতায়।

এই স্বল্প সময়ের নিরিখে যে দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা নিমেষেই মিথ্যে প্রমাণিত হয়ে গেল এক কঠিন সত্যে। মহামারীর প্রকোপ শুধু আজকের নয়, ইতিহাসের পাতায় অতি প্রাচীন বর্ণনাতেও তা পাওয়া যায়। কিন্তু সংজ্ঞাহীন এমন অযৌক্তিক সত্য পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি ব্যতীত সমস্ত সৃষ্টিকে স্তব্ধ করে রেখেছে, দীর্ঘ সময় ধরে চার দেয়ালের অন্তরালে বসে তা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। হ্যাঁ, আমি মানব সৃষ্ট মারণ ভাইরাস কোভিড-১৯ তথা করোনা ভাইরাসকেই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করছি।

বিজ্ঞানের ক্ষণিক ব্যর্থতা মনে একটাই প্রশ্ন বদ্ধমূল করে তুলেছে— কী এমন জটিলতা যা মানুষকে গৃহবন্দী করে রেখেছে দীর্ঘ সময় ধরে? এ কেমন পরিস্থিতি যা মানুষকে কিছুটা ইচ্ছের বিরুদ্ধে থামিয়ে রেখেছে এক বিস্ময়কর শক্তি বলে। এই প্রশ্নগুলো নিজেকে করার পর মুহূর্তে মনে হয় মানুষ মানুষই। তাই বিজ্ঞানের সফলতা আমার যেমন সফলতা ঠিক তেমনই তার ব্যর্থতা আসলে আমারই ব্যর্থতা। বিজ্ঞানকে আমি ছোট করছি না, আসলে তার মন্থর সমাধান-প্রক্রিয়া আমাকে কিছুদিন ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। তাই বিশ্বাসটা কিছুটা হলেও কম্পিত হয়েছে। অতীতের ব্যস্ততম দিনগুলো কেমন স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত এগুলো যেন অনেকটা পর করে দিয়েছে আমাদেরকে। শুধু আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের একাংশ এখনও জুড়ে আছে কিছু উন্নত যোগাযোগ মাধ্যম দ্বারা। সারাদিনটা কাটে কিছুটা ভয়— কিছুটা সংশয়— কিছুটা দ্বিধা কিংবা কিছুটা একাকীত্বের সাথে। টেলিভিশনের সচল সম্প্রচার দেশের পরিস্থিতি চোখের সামনে সুস্পষ্ট করে তোলে অবাক চিত্তে, আর ফুটিয়ে তোলে এক মারণ ভাইরাস কেমন করে সারা পৃথিবীকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে তার একটা চিত্রপট। শতশত মানুষ খাদ্যাভাবকে জয় করার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, কেউবা কর্মহীনতায় মর্মাহত। অন্যদিকে হুহু করে গ্রাস করছে উন্মুক্ত বিষ। প্রতিটা দিন ঢেকে ফেলছে আলো-আঁধারের মিশ্রিত মহিমায়। এক শ্রেণির মানুষ প্রতিটা মুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে নিপীড়িতের দ্বারে দ্বারে। আবার ডাক্তার-রূপী ভগবান নিজেদের দৃঢ়সংকল্প বাস্তবায়িত করে চলেছেন সময়ের হাত ধরে। ভয়ংকর ভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে দেশের অর্থ-পরিকাঠামো যা অনিদ্রায় রেখেছে বুদ্ধিজীবীদের। দেশ গড়ার স্বপ্ন অটুট রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে।

প্রতিটা দিন ঢেকে ফেলছে আলো-আঁধারের মিশ্রিত মহিমায়। এক শ্রেণির মানুষ প্রতিটা মুহূর্তে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে নিপীড়িতের দ্বারে দ্বারে। আবার ডাক্তার-রূপী ভগবান নিজেদের দৃঢ়সংকল্প বাস্তবায়িত করে চলেছেন সময়ের হাত ধরে।

একথা ঠিক, করোনা-আবহ আজ প্রকৃতিকে কিছুটা হলেও শান্তি দিচ্ছে। আধুনিক যুগের সাথে তাল মেলাতে প্রাকৃতিক সম্পদ তথা বন্যপ্রাণী এবং ভৌগোলিক পরিবেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছি আমরা। মানুষের এই অহংকারের মূল্য দিতে দিতে প্রায় নিঃশেষ হতে চলেছে তাদের অস্তিত্ব। তাই সংবাদ মাধ্যম হোক বা চাক্ষুষ, এটা লক্ষণীয় যে সেই বিধ্বস্ত, নির্জীব জীবাশ্মগুলোর মধ্যে ধীরে ধীরে আবার প্রাণ-সঞ্চয় ঘটছে। বাতাস খেলা করছে দূষণ-মুক্ত পরিবেশে। গঙ্গার জল এখন পানের যোগ্য, প্রমাণ করেছে বিজ্ঞান নিজেই। বায়ুস্তর এখন নিজের ভঙ্গিতে সানন্দে বলয় সৃষ্টি করছে নির্দ্বিধায়। এমন

প্রাণোচ্ছল দৃষ্টিভঙ্গি নির্মল করে তোলে বিষাদগ্রস্ত পৃথিবীকে।

অতএব মানুষের এমনতর বিজ্ঞান প্রযুক্তি জগতের প্রাণকেন্দ্রগুলিকে মর্মাহত করে রেখেছিল এতদিন। এই ক্ষণিকের স্বাধীনতা দিয়ে তাদেরকে নতুন করে ছন্দ ফিরে পাওয়ার পথ বলে দিয়েছে মানুষ নিজেই। তাই সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের কাছে আমাদের সকলের নিবেদন এমন হওয়া উচিত যাতে প্রযুক্তির ব্যবহার পরিমিত হয় এবং প্রকৃতির প্রাণকেন্দ্রের যেন কোনও ছন্দপতন না ঘটে। এখন ভাবার সময় এসেছে, সৃষ্টির অপব্যবহারকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বোঝানোর মাধ্যম হিসেবে যদি এই মারণ ভাইরাস ব্যাখ্যা হিসেবে আমাদের সামনে উন্মোচিত হয় তাহলে সেটা সতর্কতার ইঙ্গিত হিসেবেই বুঝতে হবে আমাদের। বাহুবলে নয়, মনের দৃঢ় সংকল্পের দ্বারাই আমরা আমাদের সৃষ্টিকে রক্ষা করতে পারবো এমন মনোবল গড়ে তুলতে হবে।

পরবর্তী জীবনযাত্রার মাধ্যমে যে এক আমূল পরিবর্তন আসতে চলেছে সেটা আমাদের সবার অবগত। তবে শিক্ষামাধ্যমে এই পরিস্থিতি গভীর ভাবে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও এক ভয়াবহ দুর্দিনের আশঙ্কা রয়েছে নিঃসন্দেহে। দেশের কর্মসংস্থান-পরিকাঠামো প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে বললেই চলে। কুটির শিল্প থেকে ছোটখাট ব্যাবসায়িক সংস্থাগুলিও প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। অর্থাভাব মানুষকে অসহায় করে তুলেছে। তাই ভবিষ্যতের অর্থনীতিতে বেশ সংকটময় পরিস্থিতি। ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয়, এতদিন মানুষকে কর্মহীন করে তোলার সংজ্ঞা ছিল— 'আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স'। কিন্তু এক মারণ ভাইরাস সমস্ত ব্যাখ্যাকে এবং দায়বদ্ধতাকে নিজের দিকে চিহ্নিত করে অত্যাশ্চর্য করেছে মানুষকে।

পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও এক ভয়াবহ দুর্দিনের আশঙ্কা রয়েছে নিঃসন্দেহে। দেশের কর্মসংস্থান-পরিকাঠামো প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে বললেই চলে। কুটির শিল্প থেকে ছোটখাট ব্যাবসায়িক সংস্থাগুলিও প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। অর্থাভাব মানুষকে অসহায় করে তুলেছে। তাই ভবিষ্যতের অর্থনীতিতে বেশ সংকটময় পরিস্থিতি।

তাই পরবর্তী সময়কে মাথায় রেখে সুদৃঢ় করতে হবে আত্মবিশ্বাস। তবে এই সংকল্পের ভিত এবং সহনশীলতা আমরা আমাদের পরিবার থেকেই উন্নত করতে পারবো। কারণ, এখন অনেকটা সময় আমরা আমাদের পরিবারের সাথেই কাটাচ্ছি। তাদের স্নেহ, স্পর্শ এবং ভালোবাসা আমাকে অনেক পরিণত ও মমতাময়ী করে তুলেছে। পরবর্তী জীবনের পঠন-পাঠন ঐক্যবদ্ধ রাখতে, মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে বন্ধুতা গড়ে তুলতে, উন্নতির অগ্রগতিকে আবার নতুন করে তুলে ধরতে এই পারিবারিক সচ্ছল পরিকাঠামো অনেকটাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করছে। এ লড়াই একার নয়, সকলের। তাই বর্তমানকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে এবং ভবিষ্যৎকে নতুন রূপে গড়ে তুলতে সকলের একতা এবং সুদৃঢ় মনোবল একান্ত ভাবে প্রয়োজন।